গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ২৬ জুন - ২ জুলাই, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

লালগড়ে গণআন্দোলন দমনের জন্যই এই আক্রমণ

এস ইউ সি আই-এর প্রতিবাদ

লালগড়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ১৮ জুন ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। আগের দিন ১৭ জুন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন ঃ

জঙ্গলমহলে 'উন্নয়নের' নামে সিপিএম নেতাদের দ্বারা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, 'মাওবাদী' দমনের নামে গ্রামে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে জনগণের উপর মধ্যযুগীয় অত্যাচার, যাকে-তাকে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ, গর্ভবতী নারীর উপর নির্যাতন, আচমকা আক্রমণ করে প্রতিবাদীদের খুন করা সহ চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভকে ভিত্তি করেই লালগড়ের জনগণ নিজেরাই আন্দোলন গড়ে তোলে। এলাকার কিছু 'মাওবাদী' থাকলেও এই আন্দোলনকে মূলত জনগণের কমিটিই পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমাদের দলও এই আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে আসছে।

জনগণের কমিটির উত্থাপিত দাবিগুলি গণতান্ত্রিক, মাওবাদীদের কথিত 'মুক্তাঞ্চল' সৃষ্টির 'কর্মসূচি' নয়। ভারতের কোথাও 'মাওবাদীরা' এভাবে জনগণের কমিটি করে প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনও করে না।

ইতিপূর্বে ঠিক যে কায়দায় রাজ্য সরকার ও সিপিএম নেতৃত্ব নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনকে 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে নৃশংস ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পক্ষে যুক্তি করেছিল, আজ সেই ঘৃণ্য কায়দায় গোটা লালগড় আন্দোলনকে 'মাওবাদী' চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়ে দমন-পীড়ন করতে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রয়োজন, মাওবাদীদের আন্দোলন বলে এই আন্দোলনকে প্রচার করা, মাওবাদীরাও এই সুযোগে প্রচারের আলোয় আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমরা মনে করি, জনগণের কমিটির গণতান্ত্রিক দাবিগুলি না মেনে এতদিন ধরে সরকার বাহ্যত 'নিশ্চুপ' থাকার ভান করে বাস্তবে ওই এলাকায় সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী ও পুলিশকে দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে হতাহত করেছে, আন্দোলনকারী জনগণকে উৎখাত করে এলাকা দখলের ষড়যন্ত্র করেছে। সাম্প্রতিককালে সিপিএমের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে। আর এটাকেই সরকার 'মাওবাদীদের ষড়যন্ত্র', 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে' — এই অজুহাত খাড়া করে বর্তমানে সামরিক অভিযান শুরু করল। এ কাজে পরিকল্পিতভাবে কিছু সংবাদমাধ্যমকে তারা ব্যবহার করছে। আমরা মনে করি, এই আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে আক্রমণ ও সিপিএমের বনধ ডাকা — সবটাই জনসাধারণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। মাওবাদী দমনের নামে আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক আক্রমণ ও হামলা শুরু হয়ে গেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, বহু হতাহত হবে, গ্রামে গ্রামে 'দোষীদের' ধরার অভিযান চলবে, লুঠপাঠ, নারী নির্যাতন, সবই চলবে। এভাবে আন্দোলন ধ্বংস করে সি পি এমের ক্রিমিনাল বাহিনী এলাকার পুনর্দখল নেবে। যদিও আবারও সংগ্রামী জনগণ মাথা তুলবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে সিপিএম ও রাজ্য সরকারের এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং দাবি জানাচ্ছি, ১) লালগড়ের আধা সামরিক বাহিনীর আক্রমণ, পুলিশি জুলুম ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, ২) জনগণের কমিটির উত্থাপিত ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি গ্রহণ ও কার্যকর করতে হবে।

লালগড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে ২২জুন কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই-এর মিছিল

"সামরিক অভিযান নয়, লালগড়ের জনগণের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি অবিলম্বে মানতে হবে"-এই দাবিতে ২০ জুন মেদিনীপুর শহরে এসইউসিআই-এর মিছিল। ২১ জুন সদরে ষেড়ুয়া ও গুড়গুড়িয়া স্কুল থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়ার দাবিতে ছাত্র-অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ-ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে সরকার বাধ্য হয়। শহরের যে দুটি স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে ২২ জুন সেখানেও বিক্ষোভ হয়েছে ক্যাম্প তুলে নেওয়ার দাবিতে।

লালগড়ে আধাসামরিক বাহিনীর আক্রমণ, পুলিশি জুলুম ও সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং জনসাধারণের কমিটির ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি কার্যকর করা; খাদ্যশস্যের দাম কমানো, রেশনে নিয়মিত সরবরাহ, পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ও মজুতদার-অসাধু ব্যবসায়ীদের দমন করা; পিটিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষকপদে নিয়োগ; আয়লা দুর্গতদের প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব গ্রহণ, কৃষিজমিগুলিকে পুনরায় চাষযোগ্য করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, নদীবাঁধগুলি অবিলম্বে মেরামত করা, সামরিক বাহিনীকে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব দেওয়া; অবিলম্বে লোডশেডিং বন্ধ করা সহ অন্যান্য দাবিতে এস ইউ সি আই-এর ডাকে

৩০ জুন

জেলায় জেলায়

ডি এম দপ্তরে গণঅবস্থান

৭ জুলাই

কলকাতায় আইন অমান্য

রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব পেশ করলেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল

এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল আসন্ন রেল বাজেট উপলক্ষে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যে রেল পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন।

পরিষেবা বিষয়ে প্রস্তাব

(১) রেলে যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সময়সূচি মেনে গাড়ি চালাতে হবে, এবং চুরি, ছিনতাই বন্ধ করতে হবে, (২) বেকার, ছাত্রছাত্রী, পরিচারিকা সহ নিম্নআয়ের মানুষ যাদের মাসিক আয় ২০০০ টাকার কম তাদের জন্য ১৫ টাকার মাসিক টিকিট চালু করতে হবে, যাতে ১০ টাকার সিকিউরিটি যুক্ত হয়ে ২৫ টাকা লাগবে। প্রস্তাবিত ২০ টাকার টিকিট করলে তাতে শেষপর্যন্ত ২০ + ১০ = ৩০ টাকা লাগবে। টিকিট নবীকরণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। নবীকরণ প্রক্রিয়ায় দালালচক্র বন্ধ করতে হবে; (৩) ৪০ শতাংশ পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তিহীনদের জন্য একজন সাথীসহ বিনাভাড়ায় রেল পরিষেবা চালু করতে হবে। এই ধরনের যাত্রীরা যেন কোনও বিশেষজ্ঞ ছাড়াই শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের সুপারিশ থাকলেই পরিচয়পত্র পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মেট্রো রেলেও এই যাত্রীদের উক্ত পরিষেবা দিতে হবে; (৪) দুই ঘণ্টার বেশি দূরত্বের লোকাল ট্রেনে টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে; (৫) দূরপাল্লার ট্রেনে উন্নত মানের পরিচ্ছন্ন ক্যাটারিং সার্ভিস চালু করতে হবে; (৬) পুনর্বাসন ছাড়া রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না; (৭) ট্রেনের প্রবেশ এবং প্রস্থান দরজা আলাদা করা প্রয়োজন; (৮) রেলের প্রিন্টিং প্রেসগুলিকে তুলে দেওয়া চলবে না।

রেলযোগাযোগ বিষয়ে প্রস্তাব ঃ

(১) জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার ইতিপূর্বে জয়নগর স্টেশনকে মডেল স্টেশন করার দাবি জানিয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীকে। সাংসদ

চারের পাতায় দেখুন

৪ ঘণ্টা ঘেরাওয়ের পর দাবি মানতে বাধ্য হলেন জয়নগরের বিডিও

তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ১৭ জুন জয়নগর ২নং ব্লকের তিন হাজারেরও বেশি মানুষ ১১ দফা দাবিতে বিডিওকে ঘেরাও করেন। আয়লা দুর্গত মানুষের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে ইতিপূর্বে এস ইউ সি আই বিডিও অফিসে আন্দোলন করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জন্য

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষ সরকারের উপর ক্ষুব্ধ। এই মানুষরাই এদিন বিডিওকে চার ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল (১) গৃহনির্মাণ অনুদান; (২) তিন মাস ধরে মাথাপিছু ২৫ কেজি চাল প্রদান; (৩) রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত মেডিক্যাল ক্যাম্প; (৪) ভেঙে যাওয়া স্কুলগুলির দ্রুত মেরামত; (৫) কৃষক ও মৎস্যচাষিদের যথাক্রমে সার, বীজ ও মাছের পোনা প্রদান; (৬) প্রত্যেককে রেশন কার্ড প্রদান; (৭) সংশোধিত নতুন বিপিএল তালিকা প্রকাশ; (৮) ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ; (৯) নদীবাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি। বিডিও তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত বেশিরভাগ দাবিই মেনে নেন এবং সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছে। ঘেরাও কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ খালেক মোল্লা, আনসার সেখ, স্বপন প্রামাণিক, মোবারক মোল্লা, অরুণ মণ্ডল, প্রদীপ সরকার, সামসুল পুরকায়েত, শংকর ভাণ্ডারি, বাবুর আলি সর্দার, সুভাষ হালদার প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ সেলিম শা, রূপম চৌধুরী, আনসার সেখ, গোবিন্দ আইড়ি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুকুমার হালদার।

কুলতলি বিডিও অফিসে ডিএসও'র বিক্ষোভ

আয়লা বিধ্বস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব, বইসহ যাবতীয় পাঠসামগ্রী প্রদান, সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে ১৮ জুন কুলতলি বিডিও অফিসে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ দেখায়। জেলা সভাপতি কমরেড বিশ্বনাথ সরদার, সম্পাদক রামকুমার মণ্ডল, সহসভাপতি দেবকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বিডিওর সঙ্গে কথা বলেন। বিডিও এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত পাত্র।

জলের দাবিতে পুরুলিয়ায় পথ অবরোধ

পুরুলিয়া জেলায় পানীয় জলের হাহাকার তীব্র হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এরকমই একটি গ্রাম মানবাজারের গাইডুমুর। এই গ্রামের একমাত্র নলকূপটিও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। গ্রামের মানুষ পানীয় জলের জন্য একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি। বাধ্য হয়ে ৯ জুন এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে প্রায় তিনশ লোক মানবাজার শহরের মুখে ইন্দকুড়িতে আড়াই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য এবং মানবাজারের সংগঠক কমরেড সীতারাম মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস্ অজিত মণ্ডল, কমল চক্রবর্তী, প্রশান্ত ব্যানার্জী, বিনোদ মণ্ডল প্রমুখ। মানবাজার ব্লকের বিডিও অবরোধস্থলে এসে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর সদস্য কমরেড সুবীর পালিত মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ১৩ জুন সকালে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি দুরারোগ্য মোটর নিউরন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি নিজে এই হাসপাতালেরই দায়িত্বশীল পদে কাজ করতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের উল্টোডাঙা-কাঁকুড়গাছি ও সল্টলেক ইউনিটের কর্মীরা হাসপাতালে পৌঁছে যান। কমরেড সুবীর পালিতের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। কেন্দ্রীয় স্টাফ ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জীর পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। 'গণদাবী' প্রেসের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তী; মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়, কমরেড কৃষ্ণা সেন। মাল্যদান করেন প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী কমরেড বাচ্চু পালিত ও মেয়ে সুকন্যা পালিত। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান হয়। তাঁর মরদেহ দমদম পাটি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ও দমদম আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন রায়। নানা গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। নিমতলা শ্মশানে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত কমরেডকে শেষবিদায় জানানো হয়।

১৯৭৭ সালের শেষদিকে পেশাদার ফটোগ্রাফার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় কমরেড পালিত দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭৮ সালের বন্যায় অতি দুর্গম এলাকায় পার্টির ফটোগ্রাফার হিসাবে দলের ত্রাণকার্য ও জনগণের দুর্দশার ছবি সংগ্রহ করেন। ঐ সময়ে 'অন্যচোখে' পত্রিকায় তিনি যুক্ত ছিলেন ও বহু মূল্যবান নিবন্ধও লেখেন। পরবর্তীকালে কানুভাই ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার পর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কানুভাই এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে শ্রমিক স্বার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দলের প্রকাশনার জন্য ছবি, প্রচারের জন্য ভিডিও তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজের পরিবারকেও দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

কমরেড পালিতের স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর ও অমায়িক। অর্পিত দায়িত্ব তিনি নীরবে পালন করতেন। ব্যবহারের গুণে অতি সহজে মানুষের মন জয় করে নিতেন। দলের সংস্কৃতিকে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিলেন। এই সংস্কৃতি তাঁর জীবনে ও আচার আচরণে প্রতিফলিত হয়ে যে মধুর ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল তার টানে হাসপাতালের উচ্চ ডিগ্রিধারী ডাক্তার থেকে সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের তিনি অত্যন্ত প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। কমরেড সুবীর পালিতের অকালমৃত্যুতে দল একজন দায়িত্বশীল ও দরদী কর্মীকে হারাল।

কমরেড সুবীর পালিত লাল সেলাম

কলেজে কলেজে এস এফ আইয়ের আক্রমণ প্রতিবাদে ডি এস ও

কলেজে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন বিরোধী ছাত্রদের উপর এস এফ আই-এর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ জুন কলেজ স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেন্ট পলস কলেজসহ অন্যান্য কলেজে এস এস এফ আই-এর আক্রমণ এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে আয়োজিত এই সভায় মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড বনমালী পন্ডা। তিনি কলেজে এস এফ আই-এর অরাজকতা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দুর্বার ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত সেন্ট পলস কলেজের আই এস এফ (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস ফোরাম)-এর অন্যতম সংগঠক রাজর্ষি সাহা এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেন। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা ছাত্ররা সভায় বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় এক প্রেস বিবৃতিতে এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন।

অ্যাবেকার হুগলি প্রোজেক্ট ম্যানেজার অফিস অভিযান

অবিলম্বে জেলার সমস্ত বিদ্যুৎহীন গ্রামে দ্রুত বিদ্যুতায়নের দাবি সহ ৪ দফা দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন, হুগলি জেলা কমিটির ডাকে ৮ জুন প্রোজেক্ট ম্যানেজার অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ে জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত গ্রামবাসী এই বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভসভায় স্মারকলিপি পাঠ করেন সংগঠনের সিঙ্গুর-হরিপাল থানা কমিটির সভাপতি নেপাল সাহা। এরপর প্রায় ৫ শতাধিক বিক্ষোভকারী মিছিল করে তালডাঙা অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

প্রোজেক্ট ম্যানেজারের কাছে দাবি করা হয়েছে, বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু এবং শেষ করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ না হলে সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক শাস্তি ঘোষণা করতে হবে। প্রকল্পটি যাতে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় তার জন্য নজরদারি কমিটি গঠন করতে হবে এবং তাতে গ্রাহক প্রতিনিধি রাখতে হবে। হুগলি জেলা অ্যাবেকার অন্যতম নেতা মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে নয় সদস্যের এক প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেন।

দাদপুর থানা সম্মেলন

১ জুন অ্যাবেকার হুগলি জেলার দাদপুর থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আমড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৪৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনে সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখেন সেখ জাহাঙ্গীর। ৯ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং মণিমোহন ঘোষ। শচীন সরকারকে সভাপতি এবং সেখ জাহাঙ্গীর ও মন্টু দিকপতিকে যুগ্মসম্পাদক করে ২৫ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

‘স্যার, এটা কি সেই পরীক্ষা যেখানে সব উত্তর বলে দেওয়া হয়?’

প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখে দিচ্ছেন মাস্টারমশাই। পরীক্ষার্থীরা দেখে নিজেদের মূল্যায়ন পত্রে লিখে নিচ্ছে। যে মাস্টারমশাই উত্তর লিখে দিচ্ছেন তিনি অন্য স্কুল থেকে ইনভিজিলেটর হিসেবে এসেছেন। ছাত্রছাত্রীরা খুশি। খুশি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সেন্টার ইনচার্জ। কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে মাস্টারমশাই বা দিদিমণিরা পরীক্ষার্থীর পাশে বসে উত্তর বলে দিচ্ছেন। যিনি ইনভিজিলেটর ছিলেন তিনিই আবার পরীক্ষার শেষে পরীক্ষকের ভূমিকায়। কলম দিয়ে মূল্যায়নপত্র দেখছেন কিন্তু তাঁর বাঁ হাতে একটা পেনসিল! সঙ্গে রাবারও রেখেছেন! পরীক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করছেন বামহাতে সঠিক উত্তর লিখে দিয়ে। এই বামহাতে লেখার উদ্দেশ্য হল, শিশু শিক্ষার্থীর মতই যেন হাতের লেখার ধরন হয়। যে শিক্ষার্থী পেত ৭, এই ভুল সংশোধনের ফলে তার নম্বর হয়ে গেল ৪৭! এরই নাম বহির্মূল্যায়ন!

একজন মাস্টারমশাই যখন নিজের স্কুলে বহির্মূল্যায়নের রুটিন দিচ্ছিলেন তখন একজন ছাত্র আচমকা তাঁর দিকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল — ‘স্যার এটা কি সেই পরীক্ষা যেখানে সব উত্তর বলে দেওয়া হয়?’

মাস্টারমশাই তো প্রথমে থতমত খেয়ে যান! একটু ধাতস্থ হলে ছাত্রটিকে জোরে ধমক দিয়ে বলেন — ‘তোকে এসব কথা কে বলেছে রে?’

— ছাত্রটি ভয়ে ভয়ে বলে — ‘দাদা বলেছে স্যার।’

— ‘তোর দাদা কী করে জানলো রে, যে উত্তর বলে দেওয়া হয়?’

‘দাদা যে এই পরীক্ষা দিয়েছিল স্যার। দাদা যে বার পরীক্ষা দিয়েছিল, সে বার বাইরে থেকে একজন স্যার পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন; তিনিই নাকি প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়েছিলেন?’ এক নিঃশ্বাসে সে বলে যায়।

ছাত্রটির জবাব শুনে মাস্টারমশাই প্রথমে থতমত হয়ে পরমুহূর্তেই আর একটি বড় মাপের ধমক দিয়ে বলেন — ‘এ্যাই ছেলে, এসব কথা বাইরে কাউকেই বলিস না যেন।’

ঐ শিক্ষার্থী বা তার মতো অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা প্রায় একই। তারা যে বাইরে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলে, তা নানাভাবে জানা যায়। অভিভাবকরা তো জানতেই পারেন। যেমন একজন অভিভাবক ইতিহাস পরীক্ষার আগের দিন তাঁর মেয়েকে ইতিহাস বইটি ভালো করে পড়বার জন্য বারবার বলায় মেয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, ‘বই না পড়লেও চলবে। বাইরে দিদিমণিরা যে সব উত্তর বলে দেন।’

উল্লেখিত ঘটনাগুলি কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এমন ঘটনা প্রায় ৯০ শতাংশ স্কুলে ঘটেছে।

এমন কেন হচ্ছে? পাশ-ফেল তো নেই, তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা অংশ, যারা ইনভিজিলেটর হিসেবে যাচ্ছেন, কেন এভাবে প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছেন?

নিজেদের স্কুলের গুণগতমান খাতায় কলমে বাড়াবার জন্য যদি তারা প্রশ্নের উত্তর বলে দিতেন, তা হলে না হয় বোধগম্য হত। কিন্তু এখানে তো তাঁদের সেই স্বার্থ নেই। তবে কেন এই অনৈতিক কাজ তাঁরা করছেন? একজন মাস্টারমশাই এই রহস্যের উন্মোচন করলেন। তিনি বললেন, বহির্মূল্যায়ন যে বছর শুরু হয় সে বছর বহু স্কুলের শিক্ষার্থীদের গুণগত মান খুবই নিচে ছিল। ফলে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ থেকে সেই স্কুলগুলিতে নোটিস পাঠিয়ে জানতে চাওয়া হয়, কেন তাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমান এত খারাপ। এই শোকজ নোটিস পাবার পর অনেক শিক্ষকই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা হয় যে, এই বহির্মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, আসলে এটা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল্যায়ন। ফলে শিক্ষার্থীদের গুণগতমান নিম্নগামী হলে তাদের হয়তো শাস্তি পেতে হবে। এই আতঙ্কের কারণে সার্কেলে সার্কেলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার এক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা বিষয়টা জানেন না, তা কিন্তু নয়। আসলে প্রাথমিকে এই বহির্মূল্যায়নের নামে প্রহসন না চালিয়ে তাঁদের উপায় নেই। কারণ এখন যদি বহির্মূল্যায়ন বন্ধ করে পাশ-ফেল প্রথা বা চতুর্থশ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা সরকার চালু করে তাহলে তাঁদের আবার নাকে খত্ দেওয়া হয়। একবার তা দিতে হয়েছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হয়ে।

তাই প্রহসন যেমন চলছে তেমনই চলুক। বস্তুত কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হবে। বহু স্কুল আছে, একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। তিনি যদি কোনও কারণে স্কুলে আসতে না পারেন, তাহলে স্কুল থাকে বন্ধ। প্রায় ৫৫ হাজার শিক্ষক পদ খালি। শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলো ধুঁকছে। পড়ুয়ার সংখ্যাও কমে আসছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা যাচ্ছে বেসরকারি স্কুলে। এই বেসরকারি স্কুলের মালিকরা আবার অনেকেই সিপিএম দলের নেতা-মন্ত্রী। আর যাদের একেবারেই সামর্থ্য নেই, তারা কী করে? তারা বিদ্যালয়ের দিকে পা বাড়ায় না। অনেকেই চলে গেছে বাবা-মার সাথে ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে। আর যারা থেকে গেছে এখানেই, তাদের মধ্যে অনেকেই ইটভাটায়, অন্যের বাড়িতে, হোটেলে, চায়ের দোকানে শ্রম দিচ্ছে নিজের ও পরিবারের অন্ন যোগাবার জন্য। বাকিদের মধ্যে অনেককেই ডি পি ই পি স্কিমের শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে টেনে নিয়ে ভর্তি করছেন শিক্ষা সহায়করা। তাঁদের চুক্তির ভিত্তিতে ১ হাজার টাকার চাকরি তো রক্ষা করতে হবে! এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি স্কুলের প্রায় গা ঘেঁষে। বলা হয়েছিল, স্কুলের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও শিশুশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে না। এখন তা সংশোধন করে এক কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। ফলে সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী কমে যাচ্ছে। আবার যাদের নাম সরকারি স্কুলের খাতায় আছে, তারাও প্রতিদিন আসে না। তারা যায় কোথায়? কেন তারা স্কুলে আসে না? সরকারি দলের লোকেরা শুধু শিক্ষকদের উপরই সব দায় চাপিয়ে দেন। এদিকে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করেও কিছুতেই স্কুলছুটের সংখ্যা কমানো গেল না কেন? মিড ডে মিল তো সপ্তাহে পাঁচদিন শুধুমাত্র একবেলা পেটের অন্ন জোগাতে পারে। সকাল-বিকেল, শনি-রবির খাবার আসবে কোথা থেকে? পরিবারের বাকিদের খাবারই বা কী করে জুটবে? এর উত্তর কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই দেবে না। এদের শৈশব ও কৈশোর কঠিন শ্রমে আটকে আছে ইটভাটায়, অন্যের বাড়িতে, চায়ের দোকানে বা হোটেলের অভ্যন্তরে। তাদের মুক্ত করবে কে? মুক্ত করলেই বা তারা খাবে কী? এর জন্য দায়ী যে অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, তা নয়া শিক্ষানীতির প্রবক্তারা স্বীকার করেন না। এদিকে স্কুলে যদি ছাত্রছাত্রী না জোটে তাহলে স্কুল কালক্রমে উঠে যাবেই। থাকবে শুধু ডিপিইপি’র শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। সেখানে শিক্ষা সহায়কদের হাজার টাকা দিলেই হবে। বছর শেষে নবীকরণ করলেই চলবে।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পঠন-পাঠন পুনরায় চালু হয়েছে এস ইউ সি আই ও এ রাজ্যের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষের ১৯ বছরের দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত আন্দোলনের ফলে। কিন্তু যেভাবে ইংরেজি শিক্ষা দান চলছে তার দ্বারা প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষা হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে শাসক দলের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কিছু ‘বিশেষজ্ঞ’ আছেন! তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে একটিও বাংলা শব্দ নেই। যাঁরা ‘মাতৃভাষায় শিক্ষার’ নামে প্রচুর চোখের জল ফেলেছিলেন তাঁরাই এখন বাংলা ত্যাগ করে ইংরেজির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই পণ্ডিতেরা কি জানেন না যে, যেসব ছেলেমেয়ে সরকারি স্কুলে পড়তে আসে, তারা বেশিরভাগই খুবই গরিব ঘরের? তাদের না আছে বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ, না আছে একজন ভালো প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্য। এদের বাবা মা মাতৃভাষাটাই ভালো করে জানেন না। ইংরেজি তো দূরের কথা। তাহলে যেসব ছেলে-মেয়ে এবিসিডি শেখারই সুযোগ পায়নি, তারা প্রথম শ্রেণীতে পড়তে এসেই ইংরেজিতে কথা বলা শিখে যাবে? স্কুলে ইংরেজি শেখার সময় মাত্র ৪০ মিনিট। এই সময়ে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ইংরেজি শিখবে তা বোধগম্য নয়। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে — ছাত্রছাত্রীদের সাথে কীভাবে ইংরেজিতে কথা বলে ভাষাটা শেখানো হবে। এখানে স্পষ্ট নির্দেশ, মাতৃভাষা ব্যবহার করা যাবে না। যাঁরা এই ফতোয়া দিয়েছেন সেই ‘পণ্ডিত’রা মনে করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়াটা নাকি অবৈজ্ঞানিক। এদের এই কথা শুনলে মনে হয়, যেন এতদিন যাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শিখেছেন, তাঁরা কেউই এই ভাষাটা শেখেননি বা জানেন না। কোনও শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত কি না তা দেশ-কাল-পরিবেশ বিচার না করে বলা যায় না। আমাদের দেশে যাদের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, যাদের ঘরের বা সামাজিক পরিবেশে ইংরাজি ভাষায় কথাবার্তা হয় না, যাঁরা আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবেই ইংরাজি শিখবে, তাদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই বিজ্ঞানসম্মত। মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিটি একদা যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে দেওয়ালে লিখেছেন, স্লোগান তুলেছেন, তাঁরা কি জানেন ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে কবির বক্তব্য কী? রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইংরাজি শিক্ষা দানের কথা বলেছিলেন। আসলে এরা চায় না সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা ভালো করে ইংরেজি ভাষাটা শিখুক। তাদের উদ্দেশ্য ইংলিশ মিডিয়াম বই দিয়ে ইংরেজি সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করা। এর ফলে যদি শিক্ষার্থীরা এই ভাষাটা আয়ত্ত করতে না পারে তাহলে গলা ফাটিয়ে বলা যাবে — ‘দেখো আমরা আগেই বলেছিলাম, দ্বিতীয় ভাষা শেখা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।’ এটাকে একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

এদিকে প্রাথমিকে পাশ-ফেল চালু করা হয়নি। সিপিএম সরকারের পণ্ডিতরা এই প্রথা তুলে দেবার সময় যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পাশ-ফেল থাকলে কচি-কাচাদের মনে পড়াশুনা সম্পর্কে ভীতি জন্মে, হীনমন্যতা গড়ে ওঠে। তাই কিছু শিখলেও ছাত্র বা ছাত্রীকে উপর ক্লাসে তুলে দিতে হবে। একজন পড়ুয়া যেকোনও কারণেই হোক দিনের পর দিন স্কুলে না এসে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়নের সময় স্কুলে এল, তখন তার পাঠ্যপুস্তকের পড়া সম্পর্কে কোনোরকম জ্ঞান বা ধারণা নেই। ধরা যাক, পড়া না শিখেই মূল্যায়নে সব বিষয়েই সে ‘চ’-মান পেল। এই ‘চ’ শূন্যও হতে পারে। তাহলেও সরকারি ফতোয়া অনুযায়ী তাকে তো উপর ক্লাসে তুলে দিতেই হবে! হচ্ছেও তাই। ফলে শিক্ষার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই হাইস্কুলের চৌকাঠ পেরোতে না পেরে স্কুলছুটের দলে নাম লেখায়। আর যারা কোনওরকমে হাইস্কুলের চৌকাঠ পেরোয়ও, তাদের বেশিরভাগই ২/৩ বছর ফেল করে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই ‘স্কুল ছুট’ দলের কলেবর বৃদ্ধি করে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণীর বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় দেখা গেছে, সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান ভয়ঙ্কর রকমের নিম্নগামী।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নিয়ে যারা বক্তৃতা দেন, তারাও বিষয়টাকে যান্ত্রিকভাবে বোঝেন। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য যে উন্নত পরিকাঠামো দরকার তা এরাজ্যের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে আছে কি? পরিকাঠামো গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হয়েছে কি? পুরানো কাঠামোর মধ্যেই এই মূল্যায়ন প্রথাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকরা খাতায়-কলমে ‘মূল্যায়ন’ করছেন। যাঁরা পরিদর্শনে যান তাঁরা তাই দেখেই খুশি। বাস্তবে কিছুই শিখছে না শিক্ষার্থীরা। ফল দাঁড়াচ্ছে বহির্মূল্যায়নের সময় কিছু অনৈতিক ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যাওয়া।

এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের অবৈজ্ঞানিক, ভ্রান্ত ও সর্বনাশা শিক্ষানীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা আজ মরণোন্মুখ, ধ্বংসের সম্মুখীন। পাশাপাশি বেসরকারি ব্যয়বহুল, ব্যবসায়িক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে বিপুল হারে। এটাই চেয়েছিল সিপিএম দল, এটাই চেয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। এটাই চেয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যতম প্রতিনিধি বিশ্বব্যাঙ্ক দেশে দেশে টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান বন্ধ করবার পরিকল্পনা নিয়ে। দেশের সরকারের সাথে চুক্তি করছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ যাতে ঘটানো যায়। উদ্দেশ্য এখানে ব্যবসা, শুধুই ব্যবসা; আর তার থেকে মুনাফা আরও মুনাফা। এই উদ্দেশ্যেই ডি পি ই পি’র (District Primary Education Programme) আবির্ভাব ও সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্ম। কোটি কোটি টাকা জলের মত খরচ হচ্ছে। ‘সকলের জন্য শিক্ষা চাই’ — এই গালভরা স্লোগানের আন্তরালে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংস করার এক নীলনক্সা তৈরি করা হয়েছে। তারা চাইছে সরকারি স্কুলের অবলুপ্তি। ইতিমধ্যে এ রাজ্যে প্রায় তিন হাজার প্রাইমারি স্কুল তুলে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষার্থী নেই এই অজুহাতে। একই অজুহাতে আরো কয়েক হাজার অবলুপ্তির পথে।

এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের অবৈজ্ঞানিক, ভ্রান্ত ও সর্বনাশা শিক্ষানীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা আজ মরণোন্মুখ, ধ্বংসের সম্মুখীন। পাশাপাশি বেসরকারি ব্যয়বহুল, ব্যবসায়িক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে বিপুল হারে। এটাই চেয়েছিল সিপিএম দল, এটাই চেয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি। এটাই চেয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যতম প্রতিনিধি বিশ্বব্যাঙ্ক দেশে দেশে টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি অনুদান বন্ধ করবার পরিকল্পনা নিয়ে। দেশের সরকারের সাথে চুক্তি করছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ যাতে ঘটানো যায়। উদ্দেশ্য এখানে ব্যবসা, শুধুই ব্যবসা; আর তার থেকে মুনাফা আরও মুনাফা। এই উদ্দেশ্যেই ডি পি ই পি’র (District Primary Education Programme) আবির্ভাব ও সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্ম। কোটি কোটি টাকা জলের মত খরচ হচ্ছে। ‘সকলের জন্য শিক্ষা চাই’ — এই গালভরা স্লোগানের আন্তরালে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংস করার এক নীলনক্সা তৈরি করা হয়েছে। তারা চাইছে সরকারি স্কুলের অবলুপ্তি।

পি টি টি আই ঃ আর কত প্রাণ গেলে হুঁশ ফিরবে সরকারের?

রাজ্যের সিপিএম সরকার পি টি টি আই সমস্যা নিয়ে চরম ছিনিমিনি খেলছে। তাদের এই ন্যক্কারজনক কাজের পরিণতিতে এ পর্যন্ত ১০ জন ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছেন। সরকার নির্বিকার। সর্বমোট ৭৬ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন বিপন্ন। এর মধ্যে ৩৪ হাজার পড়ুয়া ও বেকার শিক্ষার্থী চাকরি না পেয়ে দিশেহারা। বার বার সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে এঁদের জীবন জেরবার।

অবাক হতে হয় এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা দেখে। নির্বাচনের আগে একাধিকবার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের সাথে বৈঠক করে বলেছেন, নির্বাচনের পরেই সব মিটে যাবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে ছাত্রদের মহাকরণে ডেকে বৈঠক করে বললেন, তাঁদের উপর ভরসা রাখতে। বললেন, কোনও সমস্যা হবে না, ভোটের পরই সব মিটে যাবে। এটা যে কত বড় নির্মম পরিহাস ছিল, তা বোঝা গেল ভোটের পরে সরকারের আচরণ দেখে। অসহায় ছাত্ররা শিক্ষক-নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনার গোপন বৈঠকের সংবাদ পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দপ্তরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য। তাঁর কাছে জানতে গিয়েছিলেন, এখন যে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে — তাতে তাঁদের চাকরি হবে কি না। প্রত্যুত্তরে পেলেন পুলিশের লাঠি। বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হলেন, গ্রেফতার হলেন কয়েকজন। মন্ত্রীরা নিশ্চুপ। তাঁরা নিজেরাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন, ভোটের আগে দেওয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি কতখানি ভুয়া।

কী দোষ এই ছাত্রদের? তাঁরা কি বেআইনি কাজ করেছেন? যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে এঁরা পড়তেন — সেগুলি কি এঁরা নিজেরা তৈরি করেছেন? নাকি ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দমত ট্রেনিং কলেজে পড়তে গেছেন? সেগুলি তো সবই হয় সরকারি, নয় সরকার অনুমোদিত। বেশিরভাগ অনুমোদিত ট্রেনিং কলেজের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছেন তাতে দেখা গেছে, এগুলি চালাতেন হয় কোনও মন্ত্রী, নয় কোনও এম এল এ, নয় নেতাদের আত্মীয় পরিজন বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে এই সমস্ত ট্রেনিং কলেজগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এনসিটিই-র অনুমোদন না নেওয়া সহ উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিকাঠামোহীন ট্রেনিং কলেজগুলিকে অনুমোদন দেওয়া ও বেআইনিভাবে পরিচালনার জন্য সরকারকেই অভিযুক্ত করেছে। কোনও স্তরে পড়ুয়া বা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আদালত দোষী সাব্যস্ত করেনি। তাহলে যে সরকার বেআইনি কাজ করল, এবং আদালত তাদের দোষী সাব্যস্ত করল তারা বহাল তবিয়তে মহাকরণ, বিকাশ ভবন, শিক্ষা পর্ষদ আলোকিত করে বসে থাকেন কী করে? আর যারা দোষী নয়, সেই অসহায় ছাত্রছাত্রীরা মন্ত্রীদের সাথে একবার দেখা করতে চাইলে, তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন তুললে আইনের রক্ষক(!) পুলিশবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের মারার জন্য। প্রশ্ন হল, যাঁরা চরম বেআইনি কাজ করলেন, আইনের রক্ষাকর্তারা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

আর একটা বড় অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে, তা হল, কেন্দ্রের ভূমিকা। এখন বলা হচ্ছে রাজ্য বেআইনি কাজ করেছে, এর দায় তাদেরই নিতে হবে। কোনও দ্বিমত নেই যে, রাজ্যই মূলত দায়ী। কিন্তু এন সি টি ই কাদের? সেটা কেন্দ্রের পরিচালনাধীন। ১৯৯৫ সাল থেকে যে বেআইনি কাজ রাজ্য সরকার চালিয়ে গেল — তখন কি তা দেখেনি এন সি টি ই, না বোঝেনি? তাহলে তখন তারা কী করেছে? তখন নাকি তারা চিঠিপত্র দিয়ে সতর্ক করেছিল। ভাল কথা। কিন্তু তাদের কর্তব্য কি শুধু ওটুকুই? আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও এক্তিয়ার ছিল না? চোখের সামনে বেআইনি কাজ দেখেও তারা তখন চুপ করে বসে ছিল কেন? তাই বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়ার জন্য বেআইনি কাজও আইনসম্মত হয়ে গিয়েছিল বা চোখ বুজে চালাতে দেওয়া হয়েছিল? তখন যদি কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হত, তা হলে '৯৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দশ বছর ধরে এটা চলা সম্ভব হত না। কেন্দ্রীয় সরকার জেনেশুনে রাজ্য সরকারকে এটা চলতে দিয়েছে। ফলে এই বেআইনি কাজের ভাগীদার তো তারাও!

দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার অদ্ভুত সমস্ত প্রস্তাব দিচ্ছে। যেমন, (১) উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে; (২) উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে; (৩) ট্রেনিং কোর্স দু'বছরের হতে হবে ইত্যাদি। তার জন্য ব্রিজ কোর্স করার প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা কাউন্সিল কর্মরত শিক্ষকদের ('৯৫ সাল থেকে ট্রেনিং পাশ) কাছ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের সার্টিফিকেট ও মার্কসিটের নকল চাইছে, কতজন এই আওতার মধ্যে পড়ে, তা যাচাই করার জন্য। অথচ যখন এদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল, মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে। বহু শিক্ষক মাধ্যমিক পাশ করেই নিয়োগপত্র পেয়েছেন। তার জন্য তারা কি দায়ী? কেন তখন তাদের মাধ্যমিক পাশ বা উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের নিচের নম্বরেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল? আর এক বছরের ট্রেনিং কোর্স তো চলছে বহু বছর যাবত। রাজ্য সরকার গায়ের জোরে এই সমস্ত বেআইনি কাজ চালিয়েছে। এখন দু বছরের কোর্স এদের জন্য বলা হলে তাই বা কী করে সম্ভব? যদি ক্লাস করতে হয়, তাদের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব আরও বাড়বে। স্কুলগুলি চরম সংকটে পড়বে, শিক্ষা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিকল্প শিক্ষক দিয়েই কি এদের আর এক বছরের জন্য ট্রেনিং নিতে বলা হবে? অথবা ঘরে বসেই পড়াশোনা করে এরা পরীক্ষা দেবে? কোনটা কীভাবে হবে তা খোলসা করে বলা দরকার। চুপি চুপি গোপনীয়ভাবে কাজ করার পদ্ধতি ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এগুলি কোনটাই খুব যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা নয়। এই বেআইনি কাজের জন্য রাজ্য সরকার মূলত দায়ী, আর কেন্দ্রীয় সরকারও তার ভাগীদার। তাই তারা যৌথভাবে আলোচনা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথ বের করুক। পথ যে বের করা যায় তার নির্দশন তো বি এড সমস্যা সমাধান। সমস্যার ধরন একই, অথচ ওটা সমাধান হয়ে গেল, কিন্তু প্রাথমিকের সমস্যা রয়ে গেল শুধু নয়, তা ক্রমাগত জটিল করা হচ্ছে। বি এড সমস্যায় কেন্দ্র-রাজ্য বসে টাকা রফা করে মিটিয়ে নিলেন। টাকা দিয়ে সব বেআইনি কাজ আইনসঙ্গত হয়ে গেল। কলঙ্ক সব ঢেকে গেল। তা হলে এটাও তাই করা যায়। প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারি করা হোক, প্রয়োজনে লোকসভায় পেশ করে আইন বদল করা হোক।

এখন তো কেন্দ্রীয় সরকার স্থিতিশীল। তাঁরা তো আগেও বলেছেন, এখনও বলছেন সহানুভূতির কথা। কিন্তু তাঁরা কাজের মাধ্যমে তার নিদর্শন দেখান। এক ভোট গেল, আর এক ভোটের দিকে তাকিয়ে আরও দু'বছর এই সমস্যাকে জিইয়ে না রেখে, আরও কিছু শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে না দিয়ে তাঁরা আন্তরিকভাবে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করুন। সমস্যা সমাধানের চাবি-কাঠি তো সরকারের হাতেই। অহেতুক পরিস্থিতি জটিল না করে সত্যিকারের সমাধানের পথে কেন্দ্র ও রাজ্য এগিয়ে আসুক, অসহায় পি টি টি আই পড়ুয়া ও শিক্ষার্থীদের রক্ষা করুক।

আমাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাব — পি টি টি আই ছাত্রদের একটি আলাদা ক্যাটিগরি হিসাবে গণ্য করে তাদের সরাসরি নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এদের চাকরি দেওয়ার পর বাকি পদ অন্যদের দিয়ে পূরণ করা হোক। অন্যথায় বাঁচার তাগিদে এঁরা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হবেন।

ত্রাণ, পুনর্বাসন, নদীবাঁধ সংস্কারের দাবিতে গোসাবা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা ব্লকের আয়লাদুর্গত প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গড়ে ওঠা 'আয়লাদুর্গত জনসাধারণের কমিটি'র আহ্বানে প্রায় ৫০০ দুর্গত মানুষ ১৭ জুন গোসাবা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। বিক্ষোভ সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গোসাবা ব্লকের সমস্ত পরিবারকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পানীয় জল, খাদ্য, বস্ত্র, কেরোসিন, ত্রিপল দিতে হবে; অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; দ্রুত নদীবাঁধ মেরামত করতে হবে; ছাত্রদের ফি মকুব করতে হবে; বিনামূল্যে বই দিতে হবে; ঝড়ে, সাপের কামড়ে, ডায়েরিয়া বা আয়লার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনও ভাবে মৃতদের পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইতিপূর্বে সরকারি নির্দেশ ছিল, পাঁচ কাঠা থেকে পনেরো কাঠা পর্যন্ত পুকুরের লোনাজল সরকারি খরচে সেচে ফেলা হবে। কমিটির দাবি, অধিকাংশ গরিব মানুষের যে পাঁচ কাঠার কম আয়তনের পুকুর আছে, সেগুলিও সেচার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। দাবিগুলির সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই গোসাবা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিকাশ শাসমল এবং উদ্যোক্তাদের পক্ষে পরিমল দেবনাথ, উষা কয়াল, পূর্ণিমা মণ্ডল প্রমুখ। বিডিও-র কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন চন্দন মাইতি, পরেশ দেবনাথ, চন্দন মণ্ডল এবং অধীর বিশ্বাস। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং দ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ও লোনা জল নিষ্কাশনের আশ্বাস দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৫ মে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শুরুতেই গোসাবার এস ইউ সি আই দলের কর্মীরা ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের দাবিতে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেন এবং একইসঙ্গে তাঁরা দুর্গত মানুষের উদ্ধারকাজেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেদের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, পরিবার বিপন্ন, পরিধানের কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছুই নেই, এ সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে তাঁরা ত্রাণকার্য চালিয়ে গেছেন। এস ইউ সি আই দল এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাঠানো অর্থ এবং ত্রাণ নিয়ে ১৭ জুন পর্যন্ত ২১ দিন ধরে গোসাবার এস ইউ সি আই কর্মীরা ব্লকের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫৬টি ত্রাণকেন্দ্র থেকে প্রায় ৯০টি গ্রামের ১০,৬১০ জনকে শুকনো খাদ্য, ৭,৩৩১ জনকে জামাকাপড়, ১০৮০ জনকে শিশুখাদ্য, ১৪০০ জনকে পানীয় জলের বোতল, ১৫,০০০ জনকে রান্না করা খাবার এবং ২,৭০০ জনকে চাল দেন।

আন্ত্রিক, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের বাঁচাতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সংগঠনের উদ্যোগে এবং গোসাবার এস ইউ সি আই কর্মীদের সহায়তায় ডায়রিয়া আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকায় ১৬টি মেডিকেল ক্যাম্প থেকে প্রায় ৭,১৫৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল

একের পাতার পর

ডাঃ তরুণ মণ্ডল একই প্রস্তাব রাখেন রেল মন্ত্রীর কাছে। (২) জয়নগর পর্যন্ত শাটল ট্রেন চালু করা; (৩) ব্যস্ত সময়ে শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদা-নামখানা লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো; (৪) শিয়ালদা দক্ষিণের সমস্ত শাখায় ১২ বগির ট্রেন চালু করা এবং প্রয়োজনমতো স্টেশনগুলির দৈর্ঘ্য বাড়ানো, শিয়ালদা দক্ষিণের সমস্ত শাখায় ডবল লাইন শীঘ্র চালু করা; (৫) ক্যানিং রেললাইনকে বিস্তৃত করে এবং মাতলা নদীর উপর রেল ব্রিজ নির্মাণ করে বাসন্তীর গতখালি এবং ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন চালু করে বাসন্তী এবং গোসাবাকে রেল পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা; (৬) কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা ডবল লাইন চালু করা; (৭) আজিমগঞ্জ থেকে জিয়াগঞ্জ রেলপথ এবং রেলব্রিজ নির্মাণ করা; (৮) পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার চালু করা; (৯) চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে জেনারেল কামরা বাড়ানো; (১০) তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর লাইন দ্রুত চালু করা; (১১) ব্যান্ডেল-কাটোয়া ডবল লাইন চালু করা; (১২) কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ- শান্তিপুর ন্যারোগেজ লাইনকে ব্রডগেজ করা; (১৩) সাঁইথিয়া-কান্দি-বহরমপুর-জলঙ্গি-করিমপুর রেলপথ চালু করা; (১৪) দক্ষিণপূর্ব রেলের দেউলটি স্টেশনের নাম শরৎচন্দ্র এবং কলকাতা মেট্রোরেলের সেন্ট্রাল স্টেশনের নাম মেডিকেল কলেজ করা; (১৫) হাবড়া স্টেশনে পণ্য লোডিং-আনলোডিং ব্যবস্থা চালু করা; (১৬) দীঘা-হাওড়া এবং হলদিয়া পাঁশকুড়া রুটে (অফিস ও স্কুল-কলেজ টাইম সহ) পাঁচ জোড়া করে প্যাসেঞ্জার ট্রেনচালু করা; (১৭) ভদ্রক-খড়্গপুর-হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; (১৮) খড়্গপুর-পুরী লাইনে রাখরাবাদ স্টেশনে পুরী প্যাসেঞ্জার থামাতে হবে, বেলদা স্টেশনে সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দিতে হবে; (১৯) দীঘা-তমলুক, তমলুক-পাঁশকুড়া এবং খড়্গপুর-মেদিনীপুর ট্রেন রুট ডবল লাইন করতে হবে।

উত্তরবঙ্গের দাবি ঃ (১) এন জে পি-গৌহাটি রেল লাইনকে ডাবল লাইনে পরিণত করা; (২) কাঞ্চনকন্যা ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসকে দৈনিক করা। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রতিটি এক্সপ্রেসে ও মেল ট্রেনে জেনারেল কম্পার্টমেন্ট বৃদ্ধি করা; (৩) শিলিগুড়ি-এন জে পি থেকে মালদা; রায়গঞ্জ; আলিপুরদুয়ার ভায়া মালবাজার; জোড়াই; কোচবিহার বামনহাট; গলগলিয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একাধিক লোকাল ট্রেন চালু করা এবং সময়সূচি এমনভাবে ঠিক করা যাতে নিত্যযাত্রী ও হাটযাত্রীদের সুবিধা হয়; (৪) শিলিগুড়ি-এন জে পি- রাঙাপানি- বাগডোগরা-মাটিগাড়া চক্ররেল চালু; (৫) উত্তরবঙ্গে বৈদ্যুতিক রেল পরিষেবা দ্রুত চালু করা; (৬) শিলিগুড়ি জংশন থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর লোকাল ট্রেন চালু করা এবং কমপক্ষে একটি করে সবজি ভেন্ডার কামরা রাখা; (৭) কলকাতা-হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনকে দৈনিক করা এবং শিয়ালদহ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া; (৮) ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা রেললাইন তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করা; (৯) রাঙাপানি ও সাউথ কলোনি রেলগেটে ওভারব্রিজ তৈরি করা ও সমস্ত গেটে গেটম্যান নিয়োগ প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে প্রাক বাজেট আলোচনায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

পূর্বতন বছরের মতো এ বছরও আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটের রূপরেখা তৈরির প্রস্তুতিতে ৩ জুন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছাড়াও এস ইউ সি আই-এর শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি যোগ দেয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং অন্যতম সহসভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন।

সকল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দই এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, মন্দা দেশের শ্রমজীবী জনগণের জীবনে চরম দুর্দশার সৃষ্টি করেছে। পণ্য বিক্রির বাজার খারাপ, ফলে মজুরিও কমেছে। বেকারি বাড়ছে ব্যাপক হারে। মালিকরা সংকটের সমস্ত বোঝাটা চালান করছে শ্রমজীবী জনগণের উপর। সরকার সংকট কাটবার জন্য নানা আর্থিক প্যাকেজ দিচ্ছে, আর তা পকেটস্থ করছে মালিকরা, শ্রমিকদের কোনও উপকার হচ্ছে না।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। দেশের মোট শ্রমজীবীর ৯০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, অথচ এঁরা ডি এ, বোনাস, পি এফ, গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শেয়ারসূচক বাড়ছে, পাশাপাশি পণ্যের দামও বেড়ে চলেছে অদ্ভুতভাবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে কিছুই নেই।

এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেছেন নেতৃবৃন্দ। বাজেটে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। তাঁরা বলেছেন, রাষ্ট্রীয় শিল্প বিক্রি করা চলবে না। করের পরিধি বাড়াতে হবে। ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে নতুন করে চাকরি সৃষ্টির জন্য জোর দিতে উৎসাহ দেওয়া হোক। পোশাক, চর্ম, বস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে এবং এই শিল্পগুলির অবস্থা খারাপ, এদের সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচকে মূল্যবৃদ্ধির সঠিক প্রতিফলন ঘটে না, এটা জরুরি ভিত্তিতে দেখা দরকার। নিয়মিত কাজকে ঠিকা কাজে পরিণত করে শ্রমিকদের উপর নিদারুণ শোষণের যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তা বন্ধ করা দরকার।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, এটা সকলেরই জানা যে, সারা দেশে কয়েক লক্ষ শিল্প কারখানা বন্ধ। অথচ সরকার বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েই চলেছে। এর ফলে কী ঘটবে? প্রবাদ আছে, বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খায়। যেহেতু বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিশাল পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে আসছে, ফলে তা ক্ষুদ্রশিল্পকে ধ্বংস করবে। ভারতের অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্পকে আঘাত করে বন্ধ শিল্পের সংখ্যাই বাড়িয়ে দেবে। ফলে, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের নীতি বাতিল না করলে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বে কোনও ছেদ পড়বে না। আমাদের দৃঢ় অভিমত, ভারত সরকার ডব্লিউ টি ও থেকে বেরিয়ে আসুক।

মন্দা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সৃষ্টি। মন্দা মানে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন এবং তার ফলে বাজারের সংকোচন। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, এজন্য কি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই দায়ী নয়? তাহলে শুধুমাত্র কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা কি এর সংশোধন সম্ভব? প্রয়োজন হচ্ছে নীতিগুলিই বদলানো। তিনি বলেন, যতদিন এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে, সংকট পুরোপুরি দূর হতে পারে না। কিন্তু, কিছু রিলিফ শ্রমিকদের দেওয়া যেতে পারে এবং অবশ্যই তা দিতে হবে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প ১৮০ দিনের করা উচিত এবং মজুরিও বাড়ানো উচিত। এই প্রকল্প শহরেও সম্প্রসারিত করা উচিত — শহরগুলিও দরিদ্র এবং বেকারে ছেয়ে যাচ্ছে।

বেকারদের যতদিন কাজ দেওয়া না হচ্ছে, ততদিন পর্যাপ্ত বেকারভাতা দেওয়া উচিত। এর দ্বারা বাজারও সম্প্রসারিত হবে। মন্দা কিছুটা হলেও মোকাবিলা করার জন্য এটা জরুরি প্রয়োজন।

তিনি বলেন, কৃষি উপকরণ থেকে ভরতুকি তুলে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে কী করে আমরা আশা করতে পারি, ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাজার সম্প্রসারিত হবে? সরকারের উচিত সরকারি চাকরিতে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা, যার দ্বারা সরকারি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ হতে পারে। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী আরও বলেন, শিক্ষাকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করা উচিত। একইভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। শহর-গঞ্জ এলাকাতে পর্যাপ্ত বেড, ডাক্তার, নার্স সহ পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করা উচিত।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পর কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম নির্ধারণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। গ্যাসের দাম প্রতি কেজিতে ২ টাকা করে বাড়ানোর যে খবর দিল্লির সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, কমরেড রাধাকৃষ্ণ তা উল্লেখ করে বাজেটে সেই সিদ্ধান্ত পাল্টানোর দাবি তোলেন।

আধুনিক দাসশ্রমিক প্রসঙ্গে

জেনেভায় আই এল ও সম্মেলনে কমরেড শঙ্কর সাহা

(সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল অন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আই এল ও-র সম্মেলন। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা এই সম্মেলনে যোগ দেন। বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কে কমরেড সাহা একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এর উপর প্রতিনিধিরা আলোচনাও করেছেন। বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল। — সম্পাদক, গণদাবী)

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি বর্তমান সময়কার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা, যা আসলে দাস শ্রমিকের নামান্তর তা বাতিলের বিষয়ে আমাদের সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরতে এখানে এসেছি। এমন একটা সময়ে এই বিতর্ক হচ্ছে যখন বিশ্ব অর্থনীতি অনিরসনীয় সংকটের আবর্তে দিশেহারা এবং যে সংকট আসলে পুঁজির দ্বারা লাগাতার এবং লাগামহীন শ্রমশোষণের ফল। এই শোষণ পুঁজিবাদের সংকটই বাড়াচ্ছে, অর্থাৎ পুঁজি নিজেই তার কবর খুঁড়ছে। ডাইরেক্টর জেনারেল ইতিমধ্যেই খেয়াল করেছেন যে, অর্থনীতির সংকটের এই সমস্যাটা শুধুমাত্র ওয়ালস্ট্রিটের নয় সব স্ট্রিটের, বিশ্বের সব দেশের। রিপোর্টে তিনি বলেছেন, বিশ্বজুড়ে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ আজ প্রবল অনিশ্চয়তা এবং ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, যারা কখনও ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, কখনও হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। তিনি সতর্কতার ঘণ্টাটা এমন একটা সময়ে বাজিয়েছেন, যখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই শুরু হয়েছে, যা শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মন্দাকেই আরও তীব্রতর করবে। যেভাবে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারাচ্ছে, সর্বত্রই কারখানার দেউলিয়ার হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, বেকারি, দারিদ্র এবং অসংগঠিত শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কাজ না থাকায় সর্বত্রই সামাজিক সুরক্ষার দাবি বাড়তে থাকবে বলে তিনি মনে করেন।

এই পরিস্থিতিতে এটা পরিষ্কার যে, যারা বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছেন তাঁরা আসলে বিশ্বের মোট শোষিত জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমাজ বিকাশের ইতিহাসে স্মরণাতীত কাল থেকেই, যখন থেকে সমাজে শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই সমাজের বাইরের কাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। দাস সমাজে সমস্ত শ্রমিকই ছিল ক্রীতদাস, যেখানে দাসরা বাধ্যতামূলক শ্রম দিত এবং দমন-পীড়নটা ছিল সোজাসুজি। ভূমিদাসপ্রথায় ভূমিদাসরা একখণ্ড জমিতেই বাঁধা ছিল এবং সামন্তপ্রভুদের জন্য উৎপাদন করতে তারা বাধ্য থাকত; বিনিময়ে বাঁচার জন্য যৎসামান্যই পেত। এই দুই সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাস এবং ভূমিদাসরা উভয়েই আসলে দাসশ্রমিক, যদিও কাজের অর্থে, বহিরঙ্গে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতার অসংখ্য স্লোগানের মধ্যেও শ্রমিকেরা কার্যত বন্দি-ই, মজুরি-দাসত্বে বন্দি। এই ব্যবস্থায় সাম্যের স্লোগানটির তাদের কাছে কোনও অর্থই নেই, কারণ মালিক ও শ্রমিক সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে। একজন শ্রমের ফসল কেনে, অপরজন মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে। শোষক এবং শোষিতের মধ্যে কখনও সাম্য বিরাজ করতে পারে না। এইভাবে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে কোনওভাবেই সৌভ্রাতৃত্বও হতে পারে না। স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। শ্রমিকদের নিয়োগ, শোষণ এবং ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিকরা যেখানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেখানে শ্রমিকদের একটি স্বাধীনতা রয়েছে, তা হল, সেই মালিকের জন্য উৎপাদন করা, নয়তো ইস্তফা দিয়ে নতুন মালিকের কাছে গিয়ে একইভাবে শোষিত হওয়া।

আমি যেটা বলতে চাই, তা হল, এই তিন ধরনের সমাজব্যবস্থাই মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ভিত্তিতে পরিচালিত। এই সামাজিক ব্যবস্থাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী কোনও না কোনওভাবে শোষিত হয়েই থাকে।

কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, বিভিন্ন বক্তা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন যে, আধুনিক দাস শ্রমিকরা আসলে সেইসব নারী - পুরুষ - শিশু, যাদের এনে বিপজ্জনক সমস্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয়; ঋণের ফাঁদে পড়া মানুষ, বেআইনিভাবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া মহিলা ও শিশুরা, যাদের দিয়ে যৌন ব্যবসা করানো হয়; ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত জেল থেকে বের করে আনা শ্রমিক প্রভৃতি আরও নানা ধরনের মানুষ।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, ন্যূনতম মজুরির থেকেও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হওয়া মানুষও আসলে দাস শ্রমিক। একইভাবে যে সমস্ত শ্রমিকের জন্য কোনওরকম সামাজিক নিরাপত্তা নেই, তারাও দাস শ্রমিকই। অর্থনৈতিক মন্দা এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যেখানে শ্রমিকরা মালিকের দেওয়া যে কোনও শর্তে, যে কোনও মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এমন এক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দিনে মাত্র ২৫ টাকা খরচ করতে পারে। এই মানুষগুলিকে যদি দাস বলা না হয়, তবে দাসশ্রমিক আর কারা?

কমরেড শংকর সাহা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এই সভার সদস্যদের ভাবতে অনুরোধ করব যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই বন্দি বা দাস-শ্রমিকী ব্যবস্থা বিলোপের ক্ষেত্রে আদৌ কিছু করতে পারে কি না, নাকি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে এসে এমন এক বিকল্প সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থাকবে না এবং যেখানে শ্রমিকরা তাদের যথার্থ মর্যাদা পাবে।

কমরেড শংকর সাহা বলেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি স্মরণ করি সেই ইতিহাস, যখন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন জাহাজগুলি শ্রমিক কেনার জন্য আফ্রিকায় নোঙর ফেলত এবং নিজেদের সভ্যতাকে গড়ে তোলার জন্য তাদের দাস হিসাবে ব্যবহার করত। আজকের আমেরিকাও একইভাবে নারী ও শিশুদের বাইরে থেকে এনে যৌন ব্যবসা সহ নানা বিপজ্জনক কাজে লাগাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মজুরি দাসত্বে বাঁধা শ্রমিকদের মুক্ত করার সংগ্রাম সমাজের শোষণ-মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঝালদায় বিরসা মুণ্ডা শহীদ দিবস

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি পরিচালিত 'প্রীতিলতা ফ্রি কোচিং সেন্টার'-এর উদ্যোগে মুণ্ডা বিদ্রোহ উলগুলান-এর অবিসংবাদী নেতা বিরসা মুণ্ডার শহিদ দিবস ৯ জুন পুরুলিয়ার ঝালদা শহরে পালিত হয়। কোচিং সেন্টারের প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর প্রভাতফেরী ঝালদা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা ক'রে বিরসা মোড়ে এসে শেষ হয়। সেখানে বিরসা মুণ্ডার শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন শিক্ষক দীপক কর্মকার, বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই ঝালদা লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড তপন রজক। তিনি বলেন, যাঁর নামে পরিচিত এই মোড়, সেই বিরসা মোড়ে বর্তমানের অনেক নেতার মূর্তি বসানো হয়েছে কিন্তু শহিদ বিরসা মুণ্ডার কোনও মূর্তি নেই। আমরা দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে এখানে বিরসা মুণ্ডার মূর্তি স্থাপন করা হোক।

মূল সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ঝালদা হাইস্কুলে। মাল্যদান, উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। মূল বক্তা ছিলেন বিরসা মুণ্ডা মৃত্যুশতবার্ষিকী কমিটির যুগ্ম রাজ্য সম্পাদক বিসম্ভর মুড়া। তিনি বিরসা মুণ্ডার জীবনের, বিশেষ করে ছেলেবেলার কাহিনী ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন। এছাড়াও জারগো হাইস্কুলের শিক্ষক শক্তিপদ কুমার বিরসা মুণ্ডার জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ছাত্রছাত্রীদের নাচ, গান, আবৃত্তি সহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি মর্যাদার সাথে পালিত হয়।

প্রীতিলতা ফ্রি কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীরা

‘আয়লা’ বিধ্বস্ত ব্লকগুলিতে মানুষ ডায়েরিয়ায় মরছে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে

সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী নাকি ঘূর্ণিঝড়ের মুহূর্ত থেকেই সুন্দরবন এলাকার বিপন্ন মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ করে চলেছেন। সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘আমরা ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণে রেখেছি, না হলে এটা মহামারির আকার ধারণ করত।’ তাঁর মতে, ডায়েরিয়া নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর দাবি, ‘পাঁচশ জনের মতো প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়। এ বছর তার থেকে আলাদা কিছু হচ্ছে না’ (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১১-০৬-০৯)।

অথচ, সুন্দরবনের বিপন্ন-বিধ্বস্ত এলাকায় ডায়েরিয়া মহামারির দিকে এগোচ্ছে। একের পর এক মানুষ মরছে। দূষিত জল থেকে হাজার হাজার মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ত্রাণকর্মী এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী, যাঁরা এলাকায় এলাকায় বিপন্ন মানুষদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা এলাকাগুলির পরিস্থিতি দেখে আঁতকে উঠছেন। সবার বক্তব্য, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যদি একে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হয়, তবে শীঘ্রই মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো মরতে থাকবে।

তাহলে কি সুন্দরবনবাসীর কোনও খবরই রাখেন না সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী, নাকি বাস্তব সত্য ও নিজেদের অপদার্থতাকে আড়াল করতে বানানো বিবৃতি প্রচার করছেন? তিনি, তাঁর সরকার ও প্রশাসন কি সত্যিই খবর রাখেন, বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে? তিন সপ্তাহ আগের মানুষগুলোর চেহারা এখন কী দাঁড়িয়েছে? তারা কী খাচ্ছে? কী জল পান করছে? কী রান্না করছে? চাল-ডাল সংগ্রহ করতে পারছে কি না? পরনের কাপড়টুকু ছাড়া ক'জন মা-বোনের দ্বিতীয় কাপড় আছে? রান্নার ও স্নানের জল তারা পাচ্ছে কি না? মন্ত্রীদের কথা শুনে মনে হয় না যে, তাঁরা এ সব সংবাদ রাখেন।

মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী রাজ্যে ডায়েরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশ’ বললেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন, সরকারিভাবে ডায়েরিয়া আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা পাঁচ হাজার, আট জন মারা গেছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রীও শুনিয়েছেন তাঁর অভয়বাণী, ‘আক্রান্তরা ভাল হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে’ (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৯-০৬-০৯)। অর্থাৎ, আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নিয়ে ভাবনার তেমন কিছু নেই। এটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। কী চমৎকার! তিনি যে ৮ জনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করেছেন, সেই ৮ জন যদি তাঁরই পরিবারের কিংবা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের মানুষ হতেন, তাহলে অর্থমন্ত্রী পারতেন এমন নির্লিপ্তভাবে এ’কথা বলতে? এ কথা বলতে পারছেন কারণ, মরছে ও আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ, জনগণ, যাঁদের তারা মানুষ হিসাবে দেখেন না, দেখেন ‘ভোটার’ হিসাবে।

শুধু গোসাবা ব্লকেই
১৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে

ইতিমধ্যে শুধু গোসাবা ব্লকেই ১৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুলবাড়িতে, দোকানে, এমনকী রাস্তার উপরে বাঁশের খুঁটিতে স্যালাইনের বোতাল টাঙিয়ে পড়ে রয়েছে মানুষ। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। ৯-১০ জুন পর্যন্ত সাতজেলিয়ার দয়াপুরের অবস্থা ছিল ভীষণ সঙ্কটজনক। চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিটেফোঁটা। চার সদস্যের একটি সরকারি চিকিৎসক দল এলাকায় পৌঁছেও ফিরে যায়, কারণ সেখানে ওষুধ বা চিকিৎসা সহায়ক কোনও কিছুই ছিল না।

তখন দুটি বেসরকারি মেডিক্যাল টিম দয়াপুরে চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করছিল। তাদের সঙ্গে একজনও ডাক্তার ছিল না। তারা বলছিল, ‘আমরা চিকিৎসা সহযোগীদের উপর নির্ভর করে কাজ করছি। এখুনি আমাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য চাই’। কিন্তু সরকারি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা নেই বললে চলে। ২০০ বোতল স্যালাইন দয়াপুরের জন্য চাওয়া হয়েছিল, পৌঁছেছে ৫০ বোতল।

দয়াপুর পি সি সেন হাইস্কুলে প্রতিদিন অসুস্থ গ্রামবাসীরা দলে দলে আসছিল। ত্রাণকর্মী অনিমেশ মণ্ডল বলছিলেন, ‘পরিস্থিতি খারাপ। ডায়েরিয়ার লক্ষণ নিয়ে প্রায় ৫০০ করে মানুষ প্রতিদিন এখানে আসছে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের আরও ওষুধ চাই।’ একজন স্কুল শিক্ষক বললেন, ‘বেসরকারি উদ্যোগেই বেশি ওষুধ আসছে। কিছু ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু করা গেছে।’

যোগ্য চিকিৎসকের অভাবে গ্রামীণ ডাক্তাররা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বাজারে ও রাস্তার উপরে শুয়ে থাকা রোগীদের দেখাশুনা করছিলেন। দয়াপুর বাজারে শরৎচন্দ্র মণ্ডল বলছিলেন, ‘গত কয়েকদিনে আমি ৭০ জন গ্রামবাসীকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছি। ৬০ জনের মতো আক্রান্ত মানুষ এখনও এখানে আছেন।’ নিরঞ্জন মণ্ডল বলছিলেন, ‘আমাদের এখানে চাই আরও মশারি, আরও ওষুধ।’ বি এস এফ মাঝে মধ্যে এসে সামান্য কিছু ওষুধ দিয়ে যাচ্ছিল।

> ছোট মোল্লাখালি, কুমিরমারি, বিপ্রদাসপুর, লাহিড়িপুর ও সাতজেলিয়ায় যেন মহামারি চলছে। মানুষের অবস্থা মর্মান্তিক। কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই। চতুর্দিকে পচা দুর্গন্ধ। লোনাজল যত কমছে, এই দুর্গন্ধ তত বাড়ছে। ততই বাড়ছে ডায়েরিয়ার আক্রমণ। মন্ত্রীরা বাণী দিচ্ছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এদিকে লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া প্রভৃতি এলাকার মানুষ আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে ক্যানিং, গড়িয়া, কলকাতার দিকে পালাচ্ছে।

এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের উদ্যোগে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার এই ব্লকে ১৬টি চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। তারা এবং অন্যান্য বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি জেলা প্রশাসন ও বিডিও'র কাছে আবেদন করছিল, শুধুমাত্র জলের পাউচের উপর নির্ভর না করে জলকে স্থানীয়ভাবে দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা করুন। কিছুই করা হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম সপ্তাহেই সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল এবং এস ইউ সি আই-এর বিধানসভার পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিপন্ন মুহূর্তের করণীয় বিষয়গুলি লিখিতভাবে জানিয়ে এসেছিলেন। সরকার কিছুই করেনি। তার ফল এখন ফলছে। দয়াপুরের অবস্থা খানিকটা সামাল দেওয়া গেলেও এখন ছোট মোল্লাখালি, কুমিরমারী, বিপ্রদাসপুর, লাহিড়িপুর ও সাতজেলিয়ায় যেন মহামারি চলছে। মানুষের অবস্থা মর্মান্তিক। কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই। চতুর্দিকে পচা দুর্গন্ধ। লোনাজল যত কমছে, এই দুর্গন্ধ তত বাড়ছে। ততই বাড়ছে ডায়েরিয়ার আক্রমণ। মন্ত্রীরা বাণী দিচ্ছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এদিকে লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া প্রভৃতি এলাকার মানুষ আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে ক্যানিং, গড়িয়া, কলকাতার দিকে পালাচ্ছে।

খাদ্য ও ওষুধপত্র নিয়ে লঞ্চগুলো সাধারণত নদীর ঘাটেই থামছে। সেখান থেকে ত্রাণ নিয়ে জল ও কাদা ভেঙে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছোনোর লোক কোথায়? তার ফলে বিপুল সংখ্যক আক্রান্ত মানুষ খাদ্য ও ওষুধপত্রের নাগাল পাচ্ছে না। ত্রাণ বণ্টনের পরিকাঠামোর এই হচ্ছে দূরবস্থা। চাল-ডালের বস্তা এবং জল লঞ্চ থেকে ঘাটে নামালেই হবে না, সেগুলোকে প্রত্যন্ত এলাকায় বিপন্ন মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ করে যারা দুর্বল, রুগ্ন, অসুস্থ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। লাহিড়িপুরে একজন পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। মেডিক্যাল টীমের কাছে সেদিন সে পৌঁছতেই পারল না। কারণ তাকে নদীতে ভাঁটির দিকে আধ কিলোমিটার যেতে হবে। যাবে কী করে? পরশমণিতে স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের ৮ বছরের শিশু সন্তান রাস্তার ধারে শুয়ে। শিশুটি ডায়েরিয়ায় একেবারে কাহিল। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ডাক্তার দেখাতে ঘাটের কাছে নিয়ে যেতে পারছেন না। কারণ, তাঁরাও অসুস্থ। লাক্সবাগান এলাকায় পোলিও আক্রান্ত এক মহিলা কাদার উপর দিয়ে নিজেকে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একটি ত্রাণ-বোটের কাছে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, যদি কিছুটা চিঁড়ে-গুড় বা অন্য ত্রাণসামগ্রী পাওয়া যায়। পরশমণির তারক বর্মণ বলছিলেন, ‘আক্রান্তদের প্রত্যেকবার ঘাটের কাছে ছুটে আসতে বলাটা সত্যিই একটা অত্যাচার।’ বলছিলেন, ‘অধিকাংশ রিলিফ টিম এমনকী নদীর তীরেও উঠছে না।’

বেসরকারিভাবে ত্রাণ নিয়ে যাঁরা আসছেন, বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছোতে সরকারি কোনও যানবাহনের সহযোগিতা তাঁরা পাচ্ছেন না। অনেক টাকা খরচ করে নৌকা ভাড়া করে এলাকাগুলিতে যেতে হচ্ছে। তার ফলে, অনেকেরই ওই সব দূর এলাকায় যাওয়ার আগ্রহ থাকছে না। তাই নদীর ঘাটের কাছাকাছি ত্রাণ ও ওষুধপত্র দিয়ে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন। প্রত্যন্ত এলাকাগুলির বিপন্ন মানুষেরা সে সবের নাগাল পাচ্ছে না। বারুইপুর থেকে যাওয়া একটি ত্রাণদলের কর্মীরা বলছিলেন, ‘ত্রাণ পৌঁছে দিতে আমাদের সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সরকার যদি ত্রাণ পরিবহনের ব্যবস্থাটা করে দিত, তাহলে আমরা এই সাড়ে তিন হাজার টাকায় আরও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যেতে পারতাম।’

একটা বড় অংশের মানুষ এখন নদীবাঁধের উপর পলিথিন-শিটের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রচণ্ড গরমে সেখানে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। দুপুরবেলা মায়েরা শিশুসন্তান কোলে নিয়ে বেরিয়ে গাছতলা খুঁজছে। কিন্তু গাছ কোথায়?

সরকারের দেওয়া জলও দূষিত, তা থেকে ডায়েরিয়া ছড়িয়েছে

লাহিড়িপুর ও সাতজেলিয়ার দয়াপুরে সরকারি উদ্যোগে পাইপলাইন মারফত যে জল সরবরাহ করা হচ্ছিল, সেই জলেও ডায়েরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তা থেকেও ডায়েরিয়া ছড়িয়েছে। প্রপার গোসাবায় সরবরাহ করা জলও পচা-দুর্গন্ধ যুক্ত। এই দুটি ক্ষেত্রেই জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ তাহলে পানীয় জল পাবে কী করে? জবাব দেওয়ার কেউ নেই। মানুষ ক্ষিপ্ত, কিন্তু অসহায়। সরকার ও প্রশাসন বলে যে কিছু আছে, সেটা মানুষ বুঝতে পারছে না। অথচ, মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম সপ্তাহেই জানিয়েছিলেন, ‘কৃষিজমিকে লোনাজল মুক্ত করার কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করা হচ্ছে।... মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা আছে। সরকার অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে, তা না হলে পরিস্থিতিকে আমরা এমন চমৎকারভাবে মোকাবিলা করতে পারতাম না’ (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১১-০৬-০৯)। কী ‘চমৎকারভাবে’ তাঁরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছেন, তা মানুষ নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, ‘ভ্যাসেল মারফত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’ কিন্তু কোথায় সে সব? কোথায় তাঁর ঘোষিত সেই ‘যুদ্ধকালীন তৎপরতা’? তিন সপ্তাহ পরেও অসহায়-বিধ্বস্ত ও রাস্তায়-হাটে-বাজারে নদীবাঁধে পড়ে থাকা অসংখ্য মানুষ তো সেগুলোর নাগালই পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে গত ১৫ জুন গড়ে তোলা হয়েছে ‘আয়লা দুর্গত জনসাধারণের কমিটি’। ১৭ জুন এই কমিটি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দাবিপত্র পেশ করেছে।

সরকারি ত্রাণ বলতে কিছু নেই। বিডিও'র ভাণ্ডারে এখন সারা ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জন্য পড়ে আছে মাত্র ২০০ বস্তা চাল। সরকারিভাবে এ পর্যন্ত পরিবার পিছু দেওয়া হয়েছে ৫ কেজি চাল, ৩০০ গ্রাম ডাল এবং ৫০০ গ্রাম চিঁড়ে। বেসরকারি সংগঠনগুলোই বাস্তবে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে।

ওষুধ ও স্যালাইনের সরবরাহ
অতি সামান্য

উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালিতে অধিকাংশ মানুষকে আজও খোলা রাস্তায় পড়ে থাকতে হচ্ছে। সমস্ত টিউবওয়েল জলের তলায়। নদীবাঁধ বাঁধা হয়নি বলে জোয়ারের সময় নদীর জল এলাকায় ঢুকছে, ভাটায় বেরুচ্ছে। জল বেরিয়ে গেলেই টিউবওয়েলগুলি যখন জেগে উঠছে, তখন মানুষ সেই জল পান করছে। সেই দূষিত জল থেকে ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকহারে। সরকারিভাবে হ্যালোজেন ট্যাবলেট এবং ও আর এস বিলি করা ছাড়া আর কিছুই বাস্তবে করা হচ্ছে না। হেমনগর, সামসেরনগর, কালীতলা প্রভৃতি প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছোচ্ছে না বললে চলে। সন্দেশখালি (২)-এর মণিপুরে ইতিমধ্যে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত। সেখানকার একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার নেই। কম্পাউণ্ডারই সম্বল। গ্রামীণ ডাক্তাররাই কার্যত রোগীদের বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, অতি প্রয়োজনীয় স্যালাইন এবং ওষুধের সরবরাহ কম। ১৯ জুন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তার ও স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে গিয়ে রোগী দেখেছেন। পরদিনও তাঁরা শিবির চালিয়েছেন। কিন্তু, এইভাবে কতদিন মোকাবিলা সম্ভব, যদি সরকার অত্যন্ত দ্রুত চিকিৎসার দায়িত্ব না নেয়?

ধামাখালিতে সরকারের স্বাস্থ্য দফতর একটা কন্ট্রোল রুম খুলেছে। এদের কাজ — যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক মেডিক্যাল টিম আসছে, তাদের নাম নিজেদের তালিকায় লিখে রাখা। সেই হিসাব থেকে সরকার বলছে, উত্তর ২৪ পরগণার প্লাবিত এলাকায় কত মেডিক্যাল টিম পাঠানো হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় সরকারিভাবে যাঁদের তারা পাঠাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ডাক্তার খুবই কম, কিছু স্বাস্থ্যকর্মী যাচ্ছেন। এঁদের কাজ মূলত হ্যালোজেন ট্যাবলেট এবং ও আর এস বিলি করা।

১৮ জুন বসিরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে এবং মহকুমা সেচ দফতরে বিক্ষোভ জানালেন এস ইউ সি আই কর্মীরা। সেচ দফতর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ২৩ জুনের কোটালের আগেই তারা সমস্ত বাঁধ বেঁধে ফেলে কোটালের জলকে অন্তত আটকানোর চেষ্টা করবেন। অবিলম্বে নতুন করে টিউবওয়েল বসানো হবে। ব্রিপল খাটানোর জন্য

সাতের পাতায় দেখুন

বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি আদায়

লোডশেডিং, আয়লা ঝড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়, বজ্রপাতে পোড়া মিটার-ট্রান্সফর্মার, সর্বস্তরের গ্রাহকদের হাজার হাজার বিকল মিটার, কৃষিতে জেনাস কোম্পানির ৪০০০ মিটারে রিডিং ছাড়া ভুতুড়ে বিল ইত্যাদির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ৯ জুন বিষ্ণুপুর ডিভিশনে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ বলেন, সম্প্রতি আয়লা ঝড়ে বিষ্ণুপুর সাবডিভিশনে যে বিপর্যয় ঘটেছে তার কোনও সুরাহা হয়নি। ফলে ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। বোরো চাষের ফসল উঠে যাওয়ার পর বিদ্যুতের ব্যবহার কমে গিয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর মিটার রিডিং না নিয়েই গড় বিল পাঠাচ্ছে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য মণিমোহন ঘোষ বলেন, এর ফলে গ্রাহকদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই সব সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদলের সদস্য মণিমোহন ঘোষ, স্বপন নাগ, অমিয় গোস্বামী, কমলাকান্ত কর্মকার, শ্যাম দুয়ারি, বীরেন মণ্ডল প্রমুখের সঙ্গে ডিভিশনাল ম্যানেজারের তীব্র বাদানুবাদ হয়। অবশেষে দাবির যৌক্তিকতা ও আন্দোলনকারীদের দৃঢ়তার মুখে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির ন্যায্যতা মেনে নিতে বাধ্য হন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, কৃষি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উঁচু দণ্ডের মাথায় বসানো মিটার চোখের লেভেলে নামিয়ে এনে রিডিং দেখানো হবে, বিকল মিটারের জায়গায় নতুন মিটার আনা হবে এবং বিকল মিটার বদলানো হবে।

পরিশেষে গ্রাহকদের উদ্দেশে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলেন, একমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথেই দাবি আদায় করা সম্ভব। এজন্য জেলা, থানা ও গ্রুপ সাপ্লাই এলাকা ধরে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের শক্তির বিস্তার ঘটাতে ও তা সংহত করতে হবে। বিদ্যুৎ আন্দোলনের অন্যতম রাজ্য নেতা মণিমোহন ঘোষ ২৫ জুন বিদ্যুৎ ভবন অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান।

আয়লা দুর্গতের ত্রাণে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির কেন্দ্রীয় চ্যাপ্টার এবং আই আই টি খড়গপুর চ্যাপ্টার যৌথভাবে কুলতলির কৈখালি এলাকায় ১৩ জুন প্রায় ৬০ হাজার টাকার ত্রাণ বিতরণ করে। ডঃ শুভাশিস মাইতির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় চ্যাপ্টারের এগারো জন সদস্য এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দামোদর মাইতির নেতৃত্বে আই আই টি চ্যাপ্টারের দশ জন সদস্য এই প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছান। এ ছাড়াও অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দীপক কুমার মাইতি, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সামন্তও এই দলে ছিলেন। তাঁরা দুর্গত এলাকার পাঁচটি গ্রামে মশারি, শিশুখাদ্য প্রভৃতি বিতরণ করেন। ঘূর্ণিঝড়ে মৃত দুই ব্যক্তির পরিবারের হাতে আড়াই হাজার টাকা করে তাঁরা তুলে দেন। ত্রাণ বিতরণের পর তাঁরা ভাঙা বাঁধগুলি পরিদর্শন করেন। এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া আন্ত্রিক এবং পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখে তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সরকার থেকে অবিলম্বে পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করা, বাড়ি নির্মাণ, মাছ ধরার জাল ও নৌকার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি জীবনধারণের উপায়ের ব্যবস্থা করার স্থানীয় মানুষের দাবিগুলি তাঁরা সমর্থন করেন।

দুর্গত মানুষের ত্রাণে সামিল প্রবাসী সুন্দরবনবাসীরা

তাঁরা সকলেই বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরির স্টাফ। কিন্তু মানুষ হয়েছেন সুন্দরবনের জল-হাওয়ায়। তাই জন্মভূমির এই দুর্দিনে স্থির থাকতে পারেননি তাঁরা। যতটুকু হোক কীভাবে এই দুর্গত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানো যায়, সেই চিন্তাই তাঁদের একত্রিত করেছে 'প্রবাসী সুন্দরবনবাসী' নামে। সকলেই সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাই নিয়ে রণজিৎ মণ্ডল, পীতম্বর নস্কর, তপন বারুইরা ছুটে গেছেন দুর্গত মানুষগুলির পাশে। কীভাবে সাহায্য করতে পারেন, জানতে চেয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের কাছে। তাঁরই পরামর্শে ১০ জুন তাঁরা হাজির হয়েছিলেন প্রায় ১০ হাজার টাকার শিশুখাদ্য, গ্লুকোজ, ও আর এস, বিস্কুট, মশারি প্রভৃতি নিয়ে। সেগুলিই বিতরণ করলেন তাঁরা কৈখালি বনঘেরি এলাকার মানুষদের মধ্যে। এলাকাটি একেবারে বাঁধের গায়ে অবস্থিত হওয়ায় বাঁধ ভেঙে একেবারে তছনছ হয়ে গেছে গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলি। মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন রাস্তার উপর।

ময়ূরেশ্বরে বিডিও ডেপুটেশন

৯ জুন এসইউসি আই বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর কমিটির উদ্যোগে ২নম্বর ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সহ সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন আব্দুস সালাম এবং উত্তম কুন্ডু, লুতফর রহমান ও হামু সেখ। ডেপুটেশনে দাবি করা হয়, ১) ঘূর্ণীঝড়ে ময়ূরেশ্বর ২ নং ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ধান চাষীদের ক্ষতিপূরণ সহ বিনামূল্যে সার ও বীজ দিতে হবে। ২) সাইথিয়া, কোটাঘুর-কল্লোল রোডটিকে অবিলম্বে মেরামত করতে হবে এবং মোড়ে যাত্রীনিবাস ও শৌচাগার অবিলম্বে নির্মাণ করতে হবে। ৩) বিপিএল তালিকা সংশোধন করে প্রকৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকায় আনতে হবে। ৪) ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। বিডিও দাবিগুলি মেনে নিয়ে অতি সত্বর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

খড়গপুরে পুরপরিষেবার দাবিতে গণবিক্ষোভ

খড়্গপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে বস্তি এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সংকট তীব্র। জল সরবরাহ যেমন কম, তেমনই সব এলাকায় জলের পাইপ এখনও পৌঁছায়নি। জল নিকাশি ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নাকাল হতে হয় শহরবাসীদের। শহরের ভেতরের অধিকাংশ রাস্তাই মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ। এইসব সমস্যার সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আই খড়্গপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৪ জুন শতাধিক মানুষ পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখান ও পুরপ্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সুরঞ্জন মহাপাত্র, ডি কিটু, রবীন্দ্রনাথ বোস, সুনীতা গুপ্ত, জয়শ্রী চক্রবর্তী, বিজয় পালিত প্রমুখ। পুরপ্রধান দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও সেগুলি দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেন।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ইউনিট ইনচার্জ কমরেড নিস্তারুল ইসলাম ফুসফুসের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ৫ জুন সিউড়ি সদর হাসপাতালে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরের দিন তাঁর মরদেহ দুবরাজপুরে তাঁর বাসভবনে আনা হয়। সেখানে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী সহ জেলার বিশিষ্ট সংগঠকরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। বহু স্থানীয় কর্মী সমর্থক সহ গুণমুগ্ধ সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড নিস্তারুল ইসলাম ১৯৮০-র দশকে জঙ্গিপুরের এক গ্রামে বসবাসকালে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের যুব সংগঠনের কাজ শুরু করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে দলের চিন্তা অনুযায়ী শোষিত মানুষের স্বার্থে সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জঙ্গিপুর থেকে এসে দুবরাজপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর এখানেও তিনি দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১২ জুন বিকাল ৪টায় মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিমাংশু দত্ত মুদির সভাপতিত্বে কমরেড নিস্তারুল ইসলামের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিক সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই কমরেড নিস্তারুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কমরেড রতন মুখার্জী প্রয়াত কমরেডের প্রশংসনীয় উদ্যোগ, তাঁর নিষ্ঠা ও আকুতির কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তারাও প্রয়াত কমরেডের চরিত্রের গুণাবলীর উপর আলোচনা করেন।

কমরেড নিস্তারুল ইসলাম লাল সেলাম

সর্বস্বান্ত বোরোচাষিদের অবরোধ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি জেলার পাতকাটা ও বারপাটিয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সেচের জল না পাওয়ার জন্য বোরো চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে মাউভাসির কাছে মূল ক্যানেল প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য ভেঙে যাওয়ায় জলের এই সঙ্কট। এরই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র তাণ্ডব চাষিদের একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। এই অবস্থায় ৪ জুন 'ক্যানেল ভাঙন প্রতিরোধ ও কৃষি বাঁচাও কমিটি'র নেতৃত্বে তিন শতাধিক বোরোচাষি জলপাইগুড়ি ডি এম অফিসে এবং এ ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ঃ ১) ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, সার-বীজ-কীটনাশক এবং আমন চাষের জন্য বিনাসুদে ঋণ দিতে হবে, ২) এ ডি ও অফিস থেকে নিম্নমানের বীজ-সার-অনুখাদ্য দেওয়া এবং স্বজনপোষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। উন্নতমানের সার-বীজ-কীটনাশক ও অনুখাদ্য সরবরাহ করতে হবে এবং সরবরাহের আগে নির্দিষ্ট দ্রব্যের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ৩) ক্যানেল সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

বোরোচাষিরা শহরে মিছিল করে কদমতলায় পথ অবরোধ করে। বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ রায় ও কৃষক নেতা হরিভক্ত সর্দার।

ছাত্র অভিভাবকদের আন্দোলনে ক্যানিং-এ ফি কমল

ক্যানিং-এর দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়, ডেভিড সেশন, সেন্ট গ্যাবরিয়াল, রায়বাঘিনী সহ বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবছর ছাত্রভর্তির সময়ে ব্যাপক ডোনেশন দাবি করেন। এর প্রতিকারের জন্য অভিভাবকরা এ আই ডি এস ও'র সহায়তা চান। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও অভিভাবকদের নিয়ে ১৩ জুন একটি সভা হয়। সভা থেকে সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির উদ্যোগে ১৫ জুন মহকুমা অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। কমিটির প্রতিনিধি দল দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেন। অভিভাবকদের আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণীতে ৭৫০ টাকার পরিবর্তে কলা বিভাগে ২৫০ টাকা ও বিজ্ঞান বিভাগে ৩০০ টাকা ফি নিতে বাধ্য হয়।

এই আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-অভিভাবকরা ফি কমানোর দাবিতে ডি এস ও এবং সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

সরকার ও প্রশাসন উদাসীন

ছয়ের পাতার পর

অবিলম্বে সিমেন্ট খুঁটি সরবরাহের দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন।

আলো নেই, অন্ধকারেই রোগিদের স্যালাইন দিতে হচ্ছে

কুলতলি ব্লকে ডায়েরিয়ার আক্রমণে ইতিমধ্যে ৩ জন মারা গেছে। ক্রমাগত এই আক্রমণ বাড়ছে। মইপীঠ অঞ্চলের ঘরে ঘরে এখন ডায়েরিয়া। প্রতিদিনই এই অঞ্চলের ১০ থেকে ৩০ জন পর্যন্ত রোগী ভুবনেশ্বরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হচ্ছে। ভাসা গুড়গুড়িয়া থেকেও রোগী এখানে আসছে। অনেকের চিকিৎসা গ্রামীণ ডাক্তাররাই করছেন। দৌলবাড়ি অঞ্চলের কাঁটামারি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৯ জুন ১২ জন ভর্তি ছিল। সেখানকার জেনারেটর এক সপ্তাহ ধরে খারাপ। অন্ধকারেই রোগিদের স্যালাইন দেওয়া চলছে। সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ওই দিনই সেখানে উপস্থিত হয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে জেনারেটর সারানোর দাবি জানান। মেরিগঞ্জ-২ এলাকায় প্রতিদিন ১০-১২ জন করে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে ২/৩ ঘণ্টা মোটর ভ্যান চালিয়ে ক্যানিং হাসপাতালে। জামতলা ব্লক হাসপাতালে ওই দিন ২২ জন ডায়েরিয়ার রোগী ভর্তি ছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে এত রোগী আসছে যে, ডাক্তাররা সামাল দিতে পারছেন না। নতুন করে, অস্থায়ীভাবে হলেও ডাক্তার নিয়োগের কোনও ব্যবস্থা নেই এবং পর্যাপ্ত ওষুধপত্রও নেই দেখে সাংসদ ফোনে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ও চিফ মেডিক্যাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। অবিলম্বে এই সমস্যা দূর করার দাবি জানান।

পাথরপ্রতিমা ব্লক এলাকার জি-প্লট, বনশ্যামনগর, ব্রজবল্লভপুর, শ্রীধরনগর, অচিন্তানগর, গোপালনগর প্রভৃতি অঞ্চলে ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। জি-প্লটের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্কটজনক। এখানকার ইন্দ্রপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে এখনই ৫০-৬০ জন রোগী ভর্তি আছে। আরও রোগী আসছে, কিন্তু ভর্তির জায়গা নেই।

বাসন্তী ব্লকে ইতিমধ্যেই ডায়েরিয়ার আক্রমণে ৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার বলেছে, ডায়েরিয়ার এই স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, যদি টিউবওয়েল ও পুকুরগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা না হয়। পাউচে করে পানীয় জল সরবরাহ করাটা কখনওই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে না।

সরকার দ্রুত নদীবাঁধ বেঁধে নদীর লোনাজল আটকানোর পথেও যেমন যাচ্ছে না, তেমনি টিউবওয়েল ও পুকুরগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা এবং দ্রুত নতুন টিউবওয়েল বসানোর দায়িত্বও পালন করছে না। যেখানে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাচ্ছে, একমাত্র সেখানেই কাজে কিছুটা গতি আসছে। এলাকাগুলিতে অবিলম্বে আরও মেডিক্যাল টিম, ডাক্তার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন সহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহের দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া মানুষের বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

বিড়ি শ্রমিকদের ডি এম অফিস অভিযান

রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকরা বিভিন্ন রকম সংকটের সম্মুখীন। এক হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য সরকার নির্ধারিত মজুরি ৯২.২০ টাকা। মুর্শিদাবাদ জেলায় জেলাশাসকের উপস্থিতিতে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও মালিকপক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়েছে মজুরি দেওয়া হবে হাজার প্রতি ৪৬ টাকা। সেই মজুরিও দিচ্ছে না মালিকরা। ১০ বছর পি এফের আওতাভুক্ত হিসাবে কাজ করলে একজন বিড়ি শ্রমিকের মাসিক ৮০০ টাকা পেনশন পাওয়ার কথা। সেটাও তারা পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার মালিকদের রক্ষা করতে বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র এবং বিড়ি শ্রমিক নয় এমন লোকদের বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকা পাইয়ে দিচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত বিড়ি শ্রমিকরা। এর প্রতিবাদে ১৭ জুন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের জেলা কমিটির ডাকে ডি এম অফিস অভিযান করা হয়। প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক পুরনো কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ের সামনে জমায়েত হয়।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক আনিসুল আম্বিয়া, শিশির সিংহ, রবিউল ইসলাম, অশ্বিনী মণ্ডল, খোদা বক্স সেখ সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত

২০ টাকার পি এফ চালু করেছে, যার সাথে কোনও পেনশনের ব্যবস্থা নেই। আইন থাকা সত্ত্বেও কোনও লগবুক চালু করেনি মালিকরা।

বিড়ি শ্রমিকদের রক্ত জল করা পয়সায় তৈরি কল্যাণ তহবিলের টাকা নিয়ে চলছে দুর্নীতির রমরমা। সিআইটিইউ, আইএনটিইউসির কর্মী বলে পরিচিত কিছু লোক প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশে টাকার বিনিময়ে বিড়ি শ্রমিকদের জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।

সম্পাদক আনিসুল আম্বিয়া বিড়ি শ্রমিকদের কাছ থেকে আয়লা দুর্গতদের জন্য সংগৃহীত ২০০০ টাকা এস ইউ সি আই দলের ত্রাণ তহবিলে জমা দেন। ঐ টাকা এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত গ্রহণ করেন।

১৭ জুন এসপ্ল্যানেডে এ আই এম এস এস-এর বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়

স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর দাবিতে পথ অবরোধ

দিবারাত্রি চিকিৎসা পরিষেবা পুনরায় চালু সহ উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ঝালদা শাখার ডাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ১৫ জুন ঝালদা বাঘমুণ্ডী সড়কপথের জার্গো মোড়ে দেড় ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করেন। আদিবাসী অধ্যুষিত ও অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত ইলু-জার্গো, পুন্তি, নোয়াডি ও মাঠারী খামার এই চারটি অঞ্চলের মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল এই ইলু-প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। প্রশাসনের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দিবারাত্রি চিকিৎসা পরিষেবা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বহু মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু পেতে ছুটতে হয় প্রায় ১৫-২০ কিমি দূরে ঝালদা শহরে। এনিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক উভয়েই উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও নানা অজুহাত দেখিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চান। এইরকম অবস্থায় এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ ও আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকা থেকে প্রখর রোদ উপেক্ষা করে অবরোধে সামিল হতে আসা অনিতা মাহাতোরা বলেন, দাবি না মানলে শেষ পর্যন্ত আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ করতে বাধ্য হব। অবরোধ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত স্বনিযুক্তি সমিতি ঝালদা শাখার সভাপতি বনবিহারী মাহাতো ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী তপন রজক।

ঘূর্ণিঝড়ের তিন সপ্তাহ পরেও কুলতলির মানুষের দুর্গতি চরমে

ঘূর্ণিঝড় আয়লা সুন্দরবন এলাকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার ২২ দিন পরও মানুষ কী অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে, কুলতলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ১৬ জুন ঘুরে তা আবার প্রত্যক্ষ করে এলেন এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

ঐদিন সকালেই তিনি মেরীগঞ্জ-২ অঞ্চলের ডোঙাজোড়া গ্রামে ভাঙা নদীবাঁধ দেখতে যান। তাঁর আসার খবর শুনেই গ্রামবাসীরা জড়ো হন। নদীবাঁধ মেরামতে সরকারি তৎপরতার অভাব নিয়ে সকলেই অভিযোগ করেন। পানীয় জলের তীব্র সংকটের কথাও তাঁরা বলেন। তাঁদের মারাত্মক অভিযোগ, পুকুরের লোনা জল সেচে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএম চূড়ান্ত দলবাজি করছে। মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী নিয়ন্ত্রিত সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ যে এন জি ও-গুলিকে পুকুরের লোনাজল বের করে দেওয়ার কন্ট্রাক্ট দিয়েছে, তারা বেছে বেছে সিপিএম সমর্থকদের পুকুরের জলই শুধু বের করছে। তৃণমূল বা এস ইউ সি আই সমর্থক ও সাধারণ মানুষের পুকুরগুলি লোনাজলেই পূর্ণ হয়ে রয়েছে। বাড়ছে মশা ও মাছি। রোগ ছড়াচ্ছে দ্রুত। বাড়ি মেরামত, ত্রিপল বিলি করা, ত্রাণ বণ্টন সবকিছুতেই চলছে সিপিএমের চূড়ান্ত দলবাজি।

এরপর ডাঃ তরুণ মণ্ডল কৈলাসনগর গেলে পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি ছাড়াও তিনি গ্রামবাসীদের থেকে বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ মেরামতির কাজে সিপিএম এবং আর এস পি'র দলবাজি ও দুর্নীতির কথা শোনেন। মাটি কাটায় সরকারি ঘোষণার চেয়ে কম টাকা দেওয়া, ইচ্ছামতো কাজ দেওয়া না-দেওয়া প্রভৃতি চলছে প্রকাশ্যে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যাও ঐ এলাকায় বাড়ছে।

দুপুরে কমরেড তরুণ মণ্ডল সেখান থেকে পৌঁছান গোদাবর-কুন্দখালি অঞ্চলের বালাহারানিয়া গ্রামে। নদীবাঁধ ভাঙন দেখে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে এসে তিনি গ্রামবাসীদের অভিযোগ শোনেন। এখানে পিয়ালী নদীর বাঁধ ভেঙে বালাহারানিয়া, কুন্দখালি, আদ্ধারিয়া ও অম্বিকানগর — এই চারটি মৌজা প্লাবিত হয়ে কয়েক হাজার একর জমিতে লোনাজল ঢুকেছে। ত্রাণ নিয়ে এখানেও চলছে চূড়ান্ত দলবাজি ও দুর্নীতি।

বিকালে কমরেড তরুণ মণ্ডল দেউলবাড়ি অঞ্চলের কাঁটামারি হয়ে নৌকোয় যান বাবুরামের চক, যজ্ঞেশ্বরচক, হইধরপাড়া, চিতুরীপাড়ায়। এখানে মাতলা নদীর বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে যায়। এখানেও ত্রিপল, খাদ্য, পুকুরের লোনাজল বের করা নিয়ে চলছে দলবাজি। বাড়ছে ডায়রিয়া রোগের প্রকোপ।

সর্বত্র গ্রামবাসীদের অভিযোগ শোনার পর কমরেড তরুণ মণ্ডল গ্রামবাসীদের জানান, আয়লার দিন থেকেই তিনি বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি ও ক্যানিং-১ এর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছেন। সরকারি চিকিৎসার অপ্রতুলতা দেখে একদিকে জেলার সিএমওএইচ থেকে শুরু করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পর্যন্ত সর্বস্তরে যোগাযোগ করে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় তৎপরতা আনার চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদিকে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসক দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। পর্যাপ্ত ত্রাণের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী এবং এমনকী প্রধানমন্ত্রীর কাছেও দাবি রেখেছেন। এসবের ফলে যতটুকু ত্রাণ এসেছে, সেটাও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বণ্টন হয় বলে, যেখানে সিপিএম বা আর এস পি পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আছে, তারা সেই ত্রাণ নিয়ে দলবাজি করছে। লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরও তারা কোনও শিক্ষা না নিয়ে ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করছে এবং জনগণের আরও ঘৃণা কুড়োচ্ছে। তিনি বলেন, যতটুকু ত্রাণ আসছে, নদীবাঁধ মেরামতের যতটুকু কাজ হবে, তা দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যও চাই আপনাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন। আপনারা পঞ্চায়েতে, বিডিও অফিসে খোঁজ নিন, কত ত্রাণ এসেছে, কোথায় তা গেছে। তার সাথে আরও ত্রাণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

কমরেড মণ্ডল সন্ধ্যায় কাঁটামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখতে যান। তিনি গ্রামবাসীদের কাছে শোনেন যে, সেখানে ডাক্তার বা নার্স থাকে না, রোগী এলে চিকিৎসা না করে জামতলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। আগের দিন ডায়রিয়া আক্রান্ত কয়েকজন রোগীকে স্যালাইন দিয়ে ডাক্তার চলে যান। তা নিয়ে বিক্ষোভ চলে। হাসপাতালে গিয়ে তিনি দেখেন, জেনারেটর থাকলেও তা খারাপ হয়ে পড়ে আছে, ঘর অন্ধকার, বারান্দায় একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। প্রচণ্ড গরমে রোগীরা বারান্দায় পড়ে রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারদের কাছে তিনি জানতে চান, জেনারেটর সারানোর বা জেনারেটর ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কি না। সেখান থেকেই কমরেড মণ্ডল ফোনে সিএমওএইচ-এর সাথে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন।

রাত আটটা নাগাদ কমরেড মণ্ডল জামতলা হাসপাতালে আসেন। সেখানে ওয়ার্ডে এবং হাসপাতালের বারান্দায় মেঝেতে অসংখ্য রোগীর ভিড়, নার্স ও ডাক্তারের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। সেখানে রোগী, চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের কী কী অসুবিধা হচ্ছে, তিনি তার খোঁজ নেন এবং অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

সিউড়ি শহরে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সম্প্রতি রাস্তা সম্প্রসারণের কারণ দেখিয়ে সিউড়ি শহরে ফুটপাতের হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করে প্রশাসন। ৫ জুন বিশাল পুলিশবাহিনী সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে কয়েকশ দোকান ভেঙে দেয়। বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখার দাবিতে ১৫ জুন সিউড়ি হকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে প্রায় দুই শত হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মিছিল করে জেলা শাসক ও সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবি তোলা হয়, বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখতে হবে। এই দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমিটির সহসভাপতি এস ইউ সি আই দলের সিউড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in